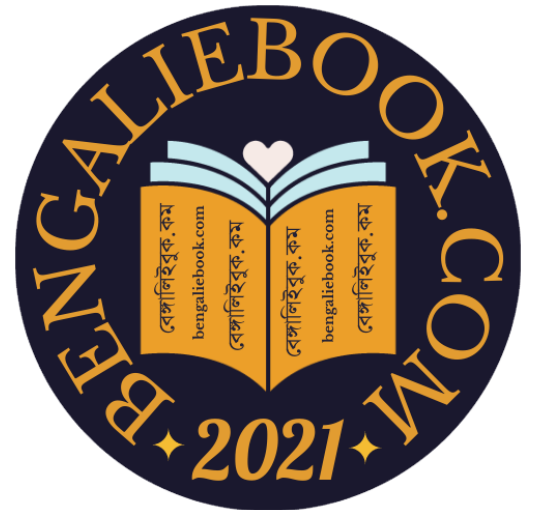


উপন্যাস

সুখ দুঃখ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



লোকটা সারাদিন তার ক্ষেতে কাজ করে। একা একা, সে মাটির সঙ্গে কত ভালবাসার কথা বলে! আল তুলে জল বেঁধে রাখার সময়ে সে ঠিক যেন এ পিপাসার্তকে জলদানের তৃপ্তি পায়। সে ভালবাসে গাছগুলিকে। যারা ফল দেয়, ছায়া দেয় দূরের মেঘকে টেনে আনে। সে প্রতিটি গাছে সুখ-দুঃখকে বোধ করার চেষ্টা করে। সে ভালোবাসে তার গৃহপালিতগুলিকেও। সে বোঝে, প্রতি-প্রত্যেকের টান-ভালবাসার ওপর সংসার বেঁচে আছে।

পাপপুণ্যময় দিনশেষে সে তার নির্জন নিকোনো ওয়াটিতে বসে। গুড়গুড় করে তামাক খায়। অন্ধকারে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশে দেবতার চোখের মতো উজ্জ্বল তারা ফুটে ওঠে। সে সেই হিম, নিখর ঐশ্বর্যের দিকে চেয়ে থাকে। দেখে বিশাল ছায়াপথ, ঐ পথ গেছে তার পূর্বপুরুষদের কাছে। কখনো ফুটফুটে জোৎস্নায় উঠোনে খেলা করে তার তিনটি শিশু ছেলেমেয়ে। সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। সে কখনো সেই নিখর আকাশকে কখনো বা সেই নিষ্পাপ তিন শিশুকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে বলে-আমি তোমাদের কাছে কোনো লাভ-লোকসান চাই না। তোমরা আমাকে অনাবিল আনন্দ দিও।

সারারাতই প্রায় সে জেগে থাকে। গোয়ালঘর থেকে গুরুর পানোর শব্দ পেলে উঠে গিয়ে মশা কিংবা উঁশ তাড়ায়। টেমি হাতে চলে আসে হাঁসের ঘরে। দেখে, তাদের ডিম স্বচ্ছন্দে প্রসব হয়েছে কিনা। ঝড়ের রাতে সে উঠে চলে যায় বাগানের গাছগুলির কাছে। বাঁশ-কাঠের ঠেকনো দিয়ে রাখে বড় গাছগুলিতে।

মাঝে মাঝে অন্ধকার নিশুত রাতে বারান্দায় বসে সে যখন তামাক খায়, তখন তার বউ আর ছেলেমেয়েরা ঘরে ঘুমোয়, ঘুমোয় তার গাছপালা, তার গৃহপালিতরা, লোকটা তখন একা জেগে দেখে, দূরের মাঠ ভেঙে ধোঁয়াটে লণ্ঠন হাতে অস্পষ্ট কার। যেন চলে যাচ্ছে, কানে আসে ক্ষীণ হরিধ্বনি। কখনো বা দেখে, ভিন গাঁয়ের দিকে মশাল হাতে চলেছে একদল লোক, তাদের হাতে বন্দুক, সড়কি, খাড়া, মুখে ভুসোকালি মাখা। লোকটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ে থাকে। তার আর ঘুম আসে না।

গ্রামের ধারে রূপোলি নদীটির পাশে শিবরাত্রি কি রথযাত্রার মেলা বসে। কত দূর থেকে রঙে ছোপানো জামাকাপড় পরে আসে অচেনা মানুষেরা। রঙিন ছেলেমেয়েরা মুখোশ পরে ঘোরে, বাজিকর খেল দেখায়। পায়ে পায়ে রাঙা ধুলোর মেঘ ওড়ে। ছেলের হাত ধরে লোকটি মেলায় আসে। ছেলেকে ডেকে বলে-মানুষের মুখ দেখ বাবা, মানুষের মুখ দেখ। এর বড় নেশা। হাটুরেরা ঘোরেফেরে, দরদাম করে। লোকটা কেনাকাটার ফাঁকে ফাঁকে অচেনা হাটুরেদের দেখে আর দেখে। কখনো বা ছেলেকে বলে-অচেনা মানুষকে একটু পর-পর লাগে রটে, কিন্তু আপন করে নেওয়া যায়। কাটা শক্ত না।

সে জানে দেশের আইন, জমি এবং ফসলের মাপ, অঙ্কের হিসেব, লোকটা জানে চিকিৎসাবিদ্যা। সে জানে, কোন উদ্ভিদের কী গুণ, কোন মাটিতে কোন ফসল, কোন বীজ থেকে কী গাছ। তাই এ গা সে গাঁ থেকে নানা জন আসে তার কাছে। আইন জেনে যায়। জমির মাপ জেনে যায়, আসে চিঠি লেখাতে কিংবা হিসেব মিলিয়ে নিতে। লোক আসে রোগের ওষুধ জানতে। সে কেবল মানুষকে দেখে আর দেখে। সে জানে, পৃথিবীর কোন কিছুই একটি ঠিক আর একটির মতো নয়। আছে বর্ণভেদ। আছে বৈশিষ্ট্যের তফাত। এক গাছের দুটি পাতাও নয় এক রকমের। সে মানুষে মানুষে সেই ভেদ দেখতে পায়। দেখে বৈশিষ্ট্য। তাই প্রতিটি মানুষের জন্য তার আলাদা বিধান; আলাদা ব্যবহার আলাদা ওষুধ। এক-একটি মানুষের অর্থ এক-একটি আলাদা জগৎ। প্রতিটি মানুষেরই আছে অস্তিত্বের বিকিরণ। মানুষ দেখতে দেখতে লোকটার এমন অবস্থা হয়, যে সে মানুষের সেই বিকিরণটি অনুভব করে। সেই বিকিরণ অনেকটা আলোর মতো বিভিন্ন মানুষের আলোর রঙ আলাদা। বড় সরল লোক সে। সে ভাবে তার মতো আর সবাইও মানুষের বিকিরণ দেখতে পায়। তাই সে কখনো হয়তো কোনো লোককে দেখে চৈঁচিয়ে বলে-এঃ হেঃ তোমার আলোটা যে লাল গো-বড্ড লাল। ও যে রাগের রঙ।

শুনে লোকে হাসে, বলে পাগল।

লোকটা নানারকমের আলো দেখেছে জীবনে। কখনো পাঠশালা থেকে ফেরার পথে-যখন বর্ষার ভারী মেঘ নিচু হয়ে ঘন ছায়া ফেলেছে চরাচরে-ঝুমকো হয়ে এসেছে আলো-তখন

মহাবীরখানের বটগাছ পেরোবার সময়ে লোকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখেছে, তার সামনে এক আলোর গাছ। আলোর ঝালর তার পাতায় পাতায়, কাণ্ডে, ডালে। তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখেছে হঠাৎ যেন পাল্টে গেছে পৃথিবীর রূপ। বাতাসে মাটিতে শূন্যে সর্বত্রই আলোময় কণা। খেলা করছে চরাচর জুড়ে আলোর কণিকাগুলি। সে দেখল নানা রঙের আলো ছাড়া আর কিছু নেই। সেই কণাগুলিই খেলার ছলে তৈরি করছে গাছপালা, মাটি, মেঘ। তারাই ঘুরছে ফিরছে, তৈরি করছে সবকিছু, আবার ভেঙে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে অন্য চেহারায়া। এই বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে ভয় পেয়ে চোখ বুজল। টের পেল, তার দেহ জুড়ে সেই কণাগুলিরই খেলা চলেছে। মাঝে-মাঝেই সে সেই কণাগুলিকে দেখতে পেত, ভাবত-তবে কি সৃষ্টির সত্য চেহারাটা এই যে, তা আলোময় এবং কণিকাময়? কখনো কখনো সে দেখেছে সেই কণাগুলির চলাফেরা ছন্দময় যেন এই মহাবিশ্বের কোনো অশ্রুত সঙ্গীতের সঙ্গে তারা সুরে বাঁধা। তাদের দোলা এবং চলা সেই ছন্দটিকে প্রকাশ করছে।

কোনো লোই তার এইসব কথা ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। সেসব বিচিত্র আলোর বর্ণনা দিত মাযের কাছে, বন্ধুর কাছে। তারা বলেছে পাগল।

সংসারী মানুষের আছে সুখবোধ। গৃহস্থ সুখ পায় পুত্রমুখ দেখে, নিজের সঞ্চয় দেখে। যত কিছু সে অধিকার করে পৃথিবীতে তত তার সুখ। লোকটার তেমন সুখ নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে তার অদ্ভুত এক আনন্দ আসে। একা একা সেই অকারণ আনন্দের প্লাবনে ভেসে যেতে যেতে সে চিৎকার করে ছেলে-বউকে ডাকে, ডাকে চেনা লোকেদের, সেই আনন্দে সবাইকে সামিল করতে। বস্তুত কেউই তার সেই আনন্দকে বুঝতে পারে না। লোকটা অবাক হয়ে ভাবে, তবে বুঝি আমি পাগলই! আমার একার জন্যই বুঝি কিছু দৃশ্য আছে, কিছু শব্দ আছে, আছে অপার্থিব আনন্দ।

মাঝে-মাঝে ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে, পোয়াল নাড়া বাঁধতে বাঁধতে, গোয়াল পরিষ্কার করতে করতে, হঠাৎ চমকে উঠে ভাবে-আরে! আমি লোকটা কে। আমি এখানে কেন? এতো আমার ক্ষেত নয়। এতো নয় আমার বাড়িঘর! আরে! আমি যেন কোথায় ছিলাম-

কোথায় ছিলাম! সে যে এক গভীর নীল স্নিগ্ধ জগৎ। সেখানে এক অদ্ভুত আলো ছিল। ছিল এক বিচিত্র সুন্দর শব্দ! সেই আমার জগৎ থেকে কে আমাকে এখানে আনল? কেন আনল এই মৃতুশীলতার মধ্যে, হঠাৎ সে চমকে উঠে বোধ করে-যে পথ দিয়ে আমি এসেছিলাম সেই পথের দুধারে ছিল অনেক তারা নক্ষত্র। সেই বীথিপথটি অনন্ত থেকে চলে গেছে অনন্তে। তার শুরু নেই শেষও নেই। সেই পথে চলতে চলতে কেন আমি থেমে গেলাম। নেমে এলাম এইখানে? এই কথা ভেবে লোকটা চারদিকে চেয়ে এক সম্পূর্ণ অচেনা ভূত অপার্থিবতাকে বোধ করে। কোনো কিছুকে সে আর চিনতে পারে না

সংসারী মানুষদের কাছে ক্ষেতখামার পশুপাখি গাছপালা ছেলেবউ। এই সবার সঙ্গে তার কোন মেথেকুরে থাকে। তারা নিজের জিনিস চেনে, চেনে পরের জিনিস। তারা সেসব জিনিমে নিজেদের চিহ্ন দিয়ে রাখে। অবিকল তাদের মতোই এই লোকটারও আছে সব। কিন্তু তাতে তার চিহ্ন দেওয়া নেই। বউ রাগ করে-তোমার বাড়ি তো বাড়ি নয়, এ হচ্ছে হাট। সারাদিন এখানে লোক আছে যায়। তোমার দিন কাটে দাওয়ায় বসে। কখনো বা বলে-তুমি অন্যের ক্ষেত থেকে পাখি-পাখালি তাড়াও, ছাগল-গরু তাড়াও, অন্যের অসুখের দাও ওষুধ, অন্যের দুঃখে গলে পড়ো। আমাদের ওপর তোর মন নেই। অথচ আমরাই তোমার আপনজন, আর এ সমস্ত তোমার নিজের জিনিস।

লোকটা ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারে না। কেমন গুলিয়ে যায়। মাঝে-মাঝে সে যে নিজেকেই অনুভব করতে পারে না ঠিকমতো, তবে নিজের বলে কী অনুভব করবে।

এ কথা সত্য যে মানুষটি পৃথিবীকে ভালবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে। গৃহস্থের এরকম হাতে নেই। গৃহস্থকে এরকম হাতে নেই। গৃহস্থকে আরো শক্ত হতে হয়, হতে হয় হিসেবি সঞ্চয়ী, তার চাই আত্মপর ভেদজ্ঞান। তার বউ বলে-আরো পাঁচ জনকে দেখ। দেখ, তারা নিজেদের ঘরে বাস করে। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি আছো পরের ঘরে।

লোকটার বউ বলে এ কথা। লোকটার বুড়ি মাও বলে। বেঁচে থাকতে লোকটার বাবাও বলত-এ সংসারে তুমি দুঃখ পাবে বলেই জন্মেছ।

লোকটা অন্যরকম বোঝে। সে যখন দাওয়ায় বসে দূরের গাঢ় ধূসর পাহাড়টিকে দেখে, যখন দেখে ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল আকাশ কিংবা নিষ্পাপ শিশুর মুখ, তখন যে অনাবিল আনন্দকে সে টের পায়, সে আনন্দ তো নিজের। সে আনন্দের কারণ হোক না তার নিজের শিশু কিংবা দূরের পাহাড় কিংবা আকাশ-না কিনা সংসারের বাইরে-তার সৌন্দর্য। তবে তো আনন্দই নিজের, সেই আনন্দই আপন করে তোলে এই বিশ্বসংসারকে। যে জানে সে জানে, পরবলে কিছু নেই।

জলে ডুবে মারা গেছে একটি শিশু। বাপ তার মৃত শিশুকে ধীর ঢেকে কোলে নিয়ে চলেছে। লোকটা থেমে চেয়ে থাকে। দেখে শিশুটির মুখখানা ঢাকা, তবে পা দুটি কেবল ঝুলে আছে। সেই শিশুটিকে কোনোদিনই দেখেনি লোকটা। আজও দেখল না। কেবল সেই চির অপরিচিত শিশুটির দুখানা পা দেখে রাখল। বুকখানা ব্যথিয়ে উঠল তার। হহ করে কান্না এল। অচেনা বাপটির মুখ দেখে ফেটে গেল বুক। বড় অবাক হল সে। ভাবতে বসল, কেন এরকম হবে। যাকে কোনদিন দেখিনি, যে আমার চেনা ছিল না, তার জন্য কান্না কেন। তাহলে কি যাদের পর করে রেখেছি তারা আমার যথার্থ পর নয়? ঐ যে এক মুহূর্তের একটু দুঃখ তা কি কাটার মতো নির্ভুল বলে দেয় না যে, ঐ অপরিচিত শিশুটিও ছিল আমারই জন। যেমন দূরের দেশে অকাল এলে, মড়ক লাগলে মানুষের প্রাণ ছটফট করে। ঐ একটু দুঃখ কি কয়েক পলকের জন্য দূর ও নিকট, আপন ও পরের ভেদরেখা মুছে দেয় না? চাবুকের মতো চকিতে আঘাত করে না মানুষের স্বার্থপরতাকে?

গাঁয়ের বুড়ো মাতব্বরা শুনে বলে তুমি বাপু আহাম্মক। অচেনা একটা জ্বলে ডোবা শিশুকে দেখে তোমার যে দুঃখ তা তো আসলে তোমার নিজের ছেলের কথা ভেবেই। ঐ যে অচেনা বাপটির মুখে তুমি শোক দেখলে, ঐ বাপের জায়গায় তুমি দেখেছে নিজেকেই। মানুষ কি পরের জন্য দুঃখ পায়। দুঃখ পায় নিজের যদি ঐ অবস্থা হয়-এই ভবে। দূরের

দেশের আকাল কি মড়কের কথা শুনে লোকে যে অস্থির হয়, তা তার নিজের দেশের কথা মনে করেই। পরের জন্য যে দুঃখ, তা আসলে নিজেরই প্রক্ষোপ।

লোকটা উঠে পড়ে। ভাবতে ভাবতে যায়; মাঝপথে ক যেন মনে পড়ে। অনি ফিরে এসে মাতব্বরদের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষটাকে বলে-বুড়োমশাই, পূর্ণিমা কি

অমাবস্যার জোরে আপনার হাঁটুতে বাতের ব্যথাটা বাড়ে, তা কি সত্যি?

- বাড়ে তো।

-তাহলে তো বলতেই হয় দূরের চাঁদের সঙ্গে আপনার শরীরের একটা সর্ক আছে! বাইরে থেকে তো তা বোঝা যায় না।

আকাশে ঘনিয়ে আসে বর্ষার গাঢ় মেঘ। ঘন মেঘের ছায়া পড়ে চারধারে। বর্ষার ব্যাঙ ডাকে। বৃষ্টি নামে। লোকটা তখন তার দরজার চৌকাঠে বসে সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে। কোন দূর থেকে বৃষ্টির ফোঁটাগুলি আসে, গাঢ় ভালবাসায় মাখে মাটিকে, ভিজিয়ে দেয় গাছপালা! বৃষ্টির শব্দে যেন কোন ভালবাসার কথা বলা হতে থাকে। সে ভাষা বোঝে না লোকটা কিন্তু টের পায়। ঐ যে বর্ষার ব্যাঙ ডাকে, গাছপালার শব্দ হয়, সে প্রাণ দিয়ে তা শোনে। তার মনে হয় ঐ ব্যাঙের ডাক মেঘকে টেনে আনে, গাছপালা তাকে আকর্ষণ করে, মাটিতে টেনে নামায় মেঘ থেকে জল-এরকম টান-ভালবাসার ওপরেই চলেছে সংসার। লোকটা সেই বৃষ্টির দৃশ্য দেখে নিখর হয়ে তার চৌকাঠে বসে থাকে তো বসেই থাকে। তার চোখের পলক পড়ে না। এমনিই বসে থেকে সে শীতের কুয়াশা দেখে, দেবে বৈশাখের ঝড়।

মাঝে-মাঝে বিছানায় শুয়ে নিতে তার ঘুম ভাঙে। বুচাপা অন্ধকার ঘরে শুয়ে আছে সে তবু তার হঠাৎ মনে হয় সে ঠিক ঘরে নেই। নিশিরাতে পরী তাকে উড়িয়ে এনেছে ঘরের বাইরে। শুইয়ে দিয়ে গেছে অরিত মাঠের মাঝখানে। ঘরের দেয়াল নেই, দরজা নেই, আগল নেই। টের পার, স্নানমুখ চাঁদের মৃদু জ্যোৎস্নার মায়াবী রূপ ধরেছে চরাচর। কুকুর

কাঁদে। বাতাসে ভাসে পায়রার পালক। পায়রার ঘর ভেঙে রক্তমাখা মুখে বেড়ালটা নিঃশব্দ থাবায় হেঁটে উঠেছে ঘরের চালে। তারপর অন্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরটা কাঁদছে, চাঁদ ও শূন্যতার দিকে চেয়ে তার দুটি ছানা নিয়ে গেছে শেয়ালে। বেড়ালটা সেই কান্না শুনে আকাশের দিকে তাকায়। দেখে, বিপুল বিস্তার। ম্লান জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় পার্থিব পালকগুলি ঝেড়ে উড়ে যায় একটি পায়রা। নিশুতরাতের মায়াবী আলোয় সে পৃথিবীর সব সীমা পার হয়। স্তব্ধ বিস্ময়ে বেড়ালটা সেই দৃশ্য দেখে। কুকুরটা কাঁদে, আর কাঁদে। চাঁদ দেখে, দেখে শূন্য। কায়াহীন সেই দূরগামী পায়রাটির দিকে একবার থাবা তোলে বেড়াটা-দূরতর পায়রাটির জন্য সে এবার লোভ বোধ করে। তারপর কুকুরের কান্না শুনে থাবাটি তুলে রেখেই সে বসে থাকে। ...

লোকটা ঘুমোয় না। প্রতিটি দুঃখীর দুঃখকেই তার বহন করতে ইচ্ছে করে, ক্ষমা করতে ইচ্ছে করে প্রতিটি পাপীকে। তার বাবা তাকে অভিশাপ দিয়েছিল-এই সংসারে দুঃখ পাবে বলেই তুমি জন্মেছ। সেই অভিশাপকে হঠাৎ তার আশীর্বাদ বলে মনে হয়। সে উঠে চলে আসে। রূপালি নদীটির ধারে অব্যবহিত মাঠটিতে। দেখে, আকাশের মহাসমুদ্র সাঁতরে ধীর গতিতে চলেছে গ্রহপুঞ্জ, অথৈ সময়কে পরিমাপ করতে চেষ্টা করে, ক্ষয় হয় যাচ্ছে তাদের জ্যোতি। লোকটির পায়ে পায়ে ক্ষণস্থায়ী ঘাসের ডগাগুলি থেকে গড়িয়ে পড়ে শিশিরের কণা। ঘরের চালে তখনো স্তব্ধ বিমর্ষতায় থাবা তুলে বসে থাকে বেড়ালটি। কুকুরটি তার দুটি হৃত সন্তানের জন্য চাঁদের দিকে মুখ করে কাঁদে। লোকটির পায়ে পায়ে শিশির ঝরতে থাকে। কেবল শিশির ঝরে যায়।

কেমন নির্বিকার বয়ে যায় রূপালি নদীটি। সেই নদীটির আছে উচ্ছ্বাস, আছে আনন্দ বেদনা তবু কেমন উদাসীনতার গৈরিক রঙ তার সর্বাঙ্গে লোকটা দোপে, আর ভাবে। দুঃখও একরকমের ভাব, সুখও একরকমের ভাব। জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া সুখকেও। সুখ-দুঃখ কোনটাই যেন ব্যাপ্ত না হয়, সব উৎপাত চুকে যাক। এই দয়া হোক তার প্রতি চিত্ত যেন উদাস থাকে। দয়া হোক তার প্রতি- এই দয়া হোক। সুখে দুঃখে তার থাক অপ্রতিহত আনন্দ, তার থাক বয়ে-যাওয়া। রূপালি নদীটি যেমন

নিয়ে যায় মানুষের আবর্জনা ক্লেদ শ্রান্তি বহন করে মানুষের বাণিজ্যের ভার! তেমনই সে বোধ করে, দুঃখ পাবে বলে নয়, সে সংসারে জন্মেছে সকলের দুঃখকে বহন করবে বলে। রূপালি নদীটির মতো নির্বিকার বয়ে যাবে।

বিনীত, সুন্দর একখানা অহংশূন্য মন নিয়ে সে চেয়ে থাকে। তখন তার চারপাশে খেলা করে আণবিক আলোর কণিকাগুলি। এক নিস্তব্ধ সঙ্গীতের দোলাচল তাদের চলাফেরায়। তার কাছে উড়ে আসে এক নীলাভ জগতের স্মৃতি, উড়ে আসে আলো, আসে সুন্দর সব শব্দ-যা এই সংসারের নয়। এক অপরূপতাকে ঘিরে ধরে। তখন একে একে নিভে যায় জাগতিক হাত, পা, চোখ এবং মন। নিভে যায় চেনা মানুষের মুখ। তখন পাখির ডিমের মতো ভোর নীল আকাশের নিচে ঘাসের ওপর সে বসে হাঁটু গেড়ে। অনুভব করে, সে আর সে নয়। এখন ভোর, আকাশের তলায়, রূপালি নদীটির পাশে, অব্যাহত মাঠের ঘাসের উপর পড়ে আছে তার বীজ। সেই বীজটিতে একটিমাত্র বোধ সংলগ্ন হয়ে আছে-আমি। যে প্রাণপণে পৃথিবীর ঘাস মাটি আঁকড়ে ধরে। যেন বা এক দূত এসে দাঁড়িয়েছে পৃথিবীর দরজায়, হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে তাকে। সে বিড়বিড় করে বলে-আর কিছুক্ষণ-আর কিছুক্ষণ আমাকে সংলগ্ন থাকতে দাও এই সংসারের সঙ্গে। তারপর আমি চলে যাবো।

গ্রামের এক প্রান্তে থাকে এক সাধক। বুড়োসুড়ো মানুষ। সাধন-ভজন আর ভিক্ষেসিক্ষে করে তার দিন কাটে। লোকটা তার কাছে যায়, তার দাওয়ায় বসে, জিজ্ঞেস করে-আপনি কি কখনো দেখেছেন আলোর গাছ? কিংবা ছন্দোবদ্ধ আলোর কণিকাগুলি? দেখেছেন মানুষ আলো বিকিরণ করে? কখনো কোন নীলাভ জগতের স্মৃতি আপনার মনে আসে না? আপনি শোনেনি সেই শব্দ যা মানুষকে ভিক্ষা করে ফেরে,

বুড়োসুড়ো মানুষটা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। তারপর মাথা নেড়ে নিঃশব্দে জানায়। অনেকক্ষণ চিন্তিত মুখে তামাক খায়। তারপর একসময়ে লোকটার দিকে চেয়ে বলে-আমি ওসব কিছুই দেখিনি বাবা, কিন্তু তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি দেখলেও বা দেখতে পারো। হয়তো সত্যিই আছে ওসব। আমিও শুনেছি সৃষ্টির মূলে আছে এক শব্দ।

লোকটার আর চাষবাস করতে ইচ্ছে করে না, যেমন ইচ্ছে করে না গরুর দুধ দোয়াতে, ইচ্ছে করে না নিজের জন্য উপার্জন করতে। তা বলে সে বসেও থাকে না। সে লোয়াজিনা সংগ্রহ করে মানুষের জন্য। সে দেখে মানুষের জ্যোতি। বৈশিষ্ট্যময়িক তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে। সে মানুষকে আকর্ষণ করে নিজের দিকে। দান করে দক্ষতা এবং ধর্ম। সে বা জনে সবই শেখায় তাদের, বর্ণভেদ অনুসারে। কেউ নেয় তার চিকিৎসাবিদ্যা, কেউ নেয় অঙ্কশাস্ত্র, কেউ শেখে চাষবাস।

বউ গঞ্জনা দেয়-তোমার সংসার যে ভেসে গেল।

লোকটা হাসে-তাই কখনো যায়!

বউ বলে-তোমার যে বৃত্তি-পেশা নেই, উপার্জন নেই!

লোকটা বলে-তা কেন! আমার সব আছে। যেখানেই আমি বীজ বপন করেছি সেখানেই দেখেছি বৃক্ষের উৎপত্তি! একথা ঠিক যে নিজের জন্য আমার কিছু করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু মানুষ যদি বুঝতে পারে যে, আমাকে বাঁচিয়ে রাখা তাদের স্বার্থের পক্ষেই প্রয়োজন, তবে তারাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। আমার লোয়াজিনা তারাই এনে দেবে আনাকে। সংসারের নরকোচটা এরকমই হওয়া উচিত। টান-ভালবাসার ওপর সংসার চলুক। আমি কোন স্বার্থ খুঁজে বেড়াব লোকের ভালবাসা জাগিয়ে দিই, তারা আমার সংসার কাকে করে নিয়ে যাবে। এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বৃত্তি।

কিন্তু বউ তা মানতে চায় না। ঝগড়া করে। ছেলেরা বড় হয়েছে, তারা বাপকে সাবধান হতে বলে। কিন্তু ততদিনে লোকটা হয়ে গেছে মানুষ-মাতাল জগতমাতাল। তার নিকটজনেরা তাকে বলে-অপদার্থ, বাউণ্ডলে। তারা মনে করে এই লোকটাই তাদের দুঃখের কারণ। তারা লোকটার হাজার দোষ দেখতে পায়, দেখে কাণ্ডজ্ঞানহীনতা।

কিন্তু যারা দূর থেকে আসে, তারা তার কাছে এসে এক আশ্চর্য সুগন্ধ পায়। তারা টের পায়, এক স্নিগ্ধ আলোর ছটা তাকে ঘিরে আছে। বলে--আহা গো কী সুন্দর গন্ধ এখানে! তুমি যে মানুষের গায়ের আলোর কথা বল, সে আলো যে তোমারও রয়েছে। বড় সুন্দর আলোটি-হাঁসের পালকের মতো সাদা-এর মধ্যে কোনো হিংসা নেই, দ্বেষ নেই। এই আলোতে দুদণ্ড বসে থাকতে ইচ্ছে করে।

কেউ বা এসে বলে-তুমি যে আমাকে ওষুধের গাছ চিনিয়েছিল, চিনিয়েছিলে রোগ নির্ণয় করতে, দেখ, সেই পেশায় আমি এখন দাঁড়িয়ে গেছি। একটা সময়ে আমি পড়ে থাকতুম বাবুদের বাড়ির আস্তাবলে, গরু-ঘোড়ার সেবা করতাম, কিন্তু সে কাজে আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না। কেউ আমাকে দেখে বুঝতে পারত না যে আসলে ও কাজ আমার নয়। আমার মধ্যে যে বৈদ্য হওয়ার গুণ আছে তা তুমিই বুঝেছিলে। এই দেখ, তোমার জন্য জামাকাপড়, তোমার বউয়ের জন্য শাড়ি-গয়না, তোমার ছেলেপুলেদের জন্য খেলা আর খাবার।

এইভাবে লোকটার সামনে অযাচিত উপহার জমে ওঠে।

যে লোকটা ছিল এ গাঁয়ের বিখ্যাত চোর, সে এসে একদিন সলজ্জ হাসিমুখে প্রণাম করে দাঁড়াল, বলল-আমাকে-মনে আছে তো তোমার? আমি ছিলাম এ-দিকের দশখানা গাঁয়ের বিখ্যাত চোর। রোজ আমি রাতে চুরি করতে বেরোতুম, আর তুমি তোমার দাওয়া থেকে আমাকে ডাক দিয়ে বলতে-ওরে আয় চুরি করতে যাবি তো তার আগে একটু তামাক খেয়ে যা। দুটো সুখ-দুঃখের গল্প করি। তা আমি বুদ্ধিটা মন্দ নয় দেখে এসে বসতাম। তামাক খেতে খেতে পাঁচটা কথা এসে পড়ত। কথায় কথায় যেত ভোর হয়ে। আমি কপাল চাপড়ে চাপড়ে দুঃখ করে বলতাম-ঐ যা, গেল আমার একরাতের রোজগার। তুমি সান্ত্বনা দিয়ে বলতে-আজ রাতে সকাল-সকাল বেরোস। আবার পারের রাতে তুমি ডাক দিতে। আবার রাত পূইয়ে যেত। আমি মনে মনে ভাবতাম, এই লোকটাই খাবে আমাকে। উপোস করিয়ে মারবে। তাই আমি তোমার দাওয়ার সামনেকার রাঙাটা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরলাম একদিন। কী করে টের পেয়ে মাঝপথে তুমি ছিলে ঘাপটি মেরে ধরলে আবার,

কথায় কথায় দিলে রাত পূইরে। রোজ এমন হতে থাকলে আমি একদিন অন্য উপায় না দেখে ধরলাম ঠেসে তোমার পা, বললাম-ঠাকুর, ব্রাহ্মণ হয়ে কেন তুমি আমার অন্ন মারছে! এ যে আমার বৃত্তি। এ না করলে যে ভাতে মরণ! তুমি হেসে বললে-আচ্ছা, আজ বাড়ি যা। তুই আর চুরির ডানিস কী? আমি তোকে চুরির ভাল কায়দা-কৌশল শিখিয়ে দেবো। আজ আমি আবো তোর সঙ্গে। শুনে ভারি ফুর্তি হল মনে। জানতাম, তোমার জানা আছে বিবিধ বিদ্যা। তুমি জানো রসায়ন, জানো গণিত, জানে বলবিদ্যা, জানো পদার্থের গুণ, তুমি সঙ্গে থাকলে আমি হবো চোরের রাজা। সেই রাতে বেরোলাম তোমার সঙ্গে। গল্পে গল্পে পথ হাটছি, যাবো ভিনগয়ে, ধনী মহাজনের দোকান লুটে আনবো দুজনে। মনে বড় ফুর্তি। হঠাৎ মাঝপথে তুমি থমকে দাঁড়িয়ে বললে-হ্যাঁরে, তোর ঘরে না সুন্দরী বৌ আছে। আমি বললাম-তা আছে তো!

তুমি বললে-আরে, তুই না একবার বলেছিলি, তোর পাশের বাড়িতে একটা বদ লোকের বাস, সে লোকটা তোর বৌয়ের দিকে নজর দেয়! আমি বলল-হ্যাঁ, সত্যি। তখন তুমি বললে-তা এই রাতে যদি সে লোকটা তোর ঘরে আসে, তুই তো রাতবিরেতে ফিরিস, তোর বৌ ঘুমচোখে উঠে দরজা খুলে দেয়। সে লোকটা হয়তো তোর গলা নকল করে ডাকবে, আর তোর বৌ উঠে দরজা খুলে দেবে। যদি তাই হয়। রাতবিরেতে এক সুন্দরী বৌকে রেখে বেরিয়েছিস-পাশেই ঘোষের বাসা-কাজটা কি ঠিক হয়েছে? অমনি বিছের কামড়ের মতো মন ছটফট করে উঠল। বললাম-তাই তো। বলে সিঁদকাঠি ফেলে দৌড় লাগালাম ঘরের দিকে। তারপর থেকে সেই বিষ-যন্ত্রণায় আর ঘর থেকে বেরোতে পারি না। রাত হলেই ঘরের বাইরে মন টানে। বাইরে বেরোই তো ঘরের কথা ভেবে ফাপর হয়ে পড়ি। সে এমন টোনায়ে পড়লাম যে খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না, রোগা হয়ে হাড় বেরিয়ে গেল। তখন আবার গিয়ে তোমার পায়ে পড়লাম-এ কী সর্বনাশ করলে আমার। আমার যে বৃত্তি ঘুচে গেল। অথচ চুরি ছাড়া আর যে আমি কিছুই শিখিনি! এখন কী করে আমার দিন চলবে? তুমি গম্ভীর হয়ে ভাবলে, ভের বললে- তোর যন্ত্রপাতিগুলো আন তো। এনে দেখালাম। তুমি সেসব দেখে-খে বললে-তুই তো তালাচাবির কলকজা ভাল চিনিস। জানিস এদের মরকোচ। দেখ তো ভাল তালা বানাতে পারিস কিনা- যে

তালা চোর খুলতে পারে না। এইসব যন্ত্রপাতি তোর সবই কাজে লাগবে তাতে। তোমার সেই কথামতো মনের দুঃখে অগত্যা তালা তৈরি করতে লাগলাম। আন্তে আন্তে সেসব তালার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল। এখন শহরে আমার ফলাও কারবার। পাঁচজন আমাকে ভদ্রলোক বলে সম্মান করে।

সেই চোর এই কথা বলে লোকটার সামনে তার পোঁটলা, খুলে দেয়, বলে তোমরা জন্য এনেছি ভাল তামাক, হুঁকো, একজোড়া শহরে চটিজুতো, ফলমূল-

এইভাবে মানুষেরা আসে। নিজেদের গল্প বলে। তাদের সংগৃহীত উপহার দিয়ে যায়। তারা জানে, এ লোকটা বেঁচে থাকলে তারা বাঁচবে, আঁচবে আরো হাজারটা লোক। তাই লোকেরা এসে তাকে ঘিরে বসে, নিজের খাবারের ভাগ দিয়ে যায়, দেয় পরিধেয়, কখনো বা শৌখীন জিনিস, রাত জেগে পাহারা দেয়।

তবু কেউই তাকে সঠিক বুঝতে পারে না। বলে-আরে! আহাম্মকটাকে দেখছি বিগ্রহ বানিয়েছে সবাই। প্রণামীর ঠেলায় আহাম্মকটা যে হয়ে গেল ধনী। কেউ বলে ঘড়েল লোকটাকে দেখ, আহাম্মকদের মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে!

এরকম বিবিধ কথা হয় লোকটার সম্বন্ধে। কিন্তু সকলেরই জিজ্ঞাসাবাপু, তুমি আসলে কে? আসলে কী? তুমি সত্যিকারে কেমন?

লোকটা উত্তর দিতে পারে না। আলো যেমন বলতে পারে না-আমি আলো, বাতাস যেমন বলতে পারে না-আমি বাতাস; সেইরকম সেও বলতে পারে না সে কী বা কে। কিন্তু মানুষের প্রাণে প্রাণে ছড়িয়ে পড়ে সে নিজেকে একরকম অনুভব করে। বুঝতে পারে যোজন যোজন বিস্তৃত তার অস্তিত্ব। সে কেবল পৃথিবীকে ভালবেসে গলে যায়। গলে যায় মানুষের দুঃখ দেখে।

চৈতন্যময় আলোর আণবিক কণিকাগুলি তাকে ঘিরে খেলা করে। তার ভিতর থেকে স্পন্দমান সৃষ্টির মূল শব্দটি উঠে আসতে থাকে। লোকটা ময়ূরপুচ্ছের মতো নীল

আকাশের দিকে চায়, চেয়ে থাকে দূরের পাহাড়টির দিকে। হঠাৎ অনুভব করে, তারই অস্তিত্ব থেকে জন্ম নিচ্ছে আকাশ, বাতাস, নক্ষত্রপুঞ্জ, আলো এবং অন্ধকার। ঐ যে দূরের পাহাড়টি, রূপালি নদীটি, ঐ যে অব্যবহৃত মাঠ, অচেনা যেসব মানুষ চলেছে রাস্তা দিয়ে, এই যেসব গাছপালা, পশুপাখি এই সবই জন্ম নিচ্ছে তার অস্তিত্ব থেকে, ল্য পাচ্ছে তারই ভিতরে। সে তার এই অনন্ত অস্তিত্বের কথা লোককে বলতে পারে না। সে রাত জেগে দাওয়ায় বসে গুড়গুড় করে তামাক খায়, আর ভাবে, আর অনুভব করে। অনাবিল এক আনন্দের স্রোত তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। সে সেই আনন্দের ভাগ কাউকেই দিতে পারে না। সে ঘোরেফেরে তার গাছপালাগুলির কাছে, বলে বেঁচে থাকে। বেড়ে ওঠে। সে পশুপাখি, গৃহপালিতদেরও বলে-বেঁচে থাকে। বেড়ে ওঠে। সে তার ছোট ছেলেটির মাথায় হাত রেখে বলে-বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠো। তার দেহ থেকে সৌরভ এবং আলোর মতো ঐ কথা সমস্ত বিশ্বচরাচরে ছড়িয়ে যায়-বেঁচে থাকো। বেড়ে ওঠে।

তারপর একদিন পড়ে থাকে তার সংসার, তার সম্বিত সম্পদ। সে এল একা চলে আসে পাহাড়ে। একটা গুহা খুঁজে বের করে। গুহায় ঢুকে সে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয় ভারী পাথরে। তারপর সেই নিস্তব্ধতায় বসে নে মানুষের জন্য কয়েকটি সং চিন্তা করে মরে যায়।

লোকটা মরে যায়, তার সেই চিলি কিন্তু মরে না। তারা ধীরে ধীরে তার দেহ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ঘুরে ঘুরে গুহা থেকে বেরোবার মুখ খোঁজে। তারপর তারা পাহাড় ভেদ করে, পার হয় নদী, প্রান্তর, পার হয়ে যায় সমুদ্র। অদৃশ্য কয়েকটি অলীক পাখির মতো মানুষের কাছে চলে আসে। ঘুরে ঘুরে বলে-তমসার পাড়ে আছেন এক আলোকময় অনামী পুরুষ। আমরা তার কাছ থেকে এসেছি, তোমরা আমাদের গ্রহণ কর।

কিন্তু, নিজের সুখ-দুঃখে কাতর মানুষ সেই ডাক শুনতেই পায় না।